জার্মান কবিতার বাংলা অনুবাদ

অর্চিতা রায়চৌধুরী

উনবিংশ বা উনিশ শতক থেকেই জার্মান সাহিত্যে ও কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা গেল। ইউরোপে তখন ঘটে গেছে শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব। সেই সঙ্গে সমাজের কাঠামোর বদল হল। সাহিত্যে শেষ হল ক্লাসিক্যাল যুগ বা ধ্রুপদী রচনার যুগ। ঐ সময়ে সমাজে কর্তৃত্ব করছেন একদল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিবিদ। ফ্রান্সে জুলাই ১৮৩০ সালে যে বিপ্লব ঘটল তার কিছুটা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া জার্মানীর একীকরণ, অর্থ ও ক্ষমতার সমবন্টন প্রভৃতি নতুন নতুন দাবিতে সোচচার "ইয়ং জার্মান" গোষ্ঠীর লেখকরা নিগৃহীত হতে লাগলেন রাজ-দরবারে। তার ফলে কিছু লেখক, কবি, শিল্পী "ইয়ং জার্মানী" আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন আর কিছু শান্তিপ্রিয় বুদ্ধিজীবী নীরব হয়ে সরে রইলেন। হেনরিস হাইনের থেকেই শু হল রোমান্টিক যুগ কবিতায়, সাহিত্যে। তিনি প্রখর ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি, ব্যবস্থার সমালোচনা করলেন। মূলত রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই লিখলেন সাংবাদিকধর্মী কিছু রচনা। ১৮৫৩ সালে তাই হাইনের রচনার ওপর জার্মানীতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। জুলাই বিপ্লবের সমর্থনে তিনি লিখলেন "বুক অব ট্রাভেলস"। হাইনে ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়। ঠাকুরবাড়ির কাগজ 'সাধনা'র মে ১৮৯২ সালের সংখ্যায় (বৈশাখ ১২৯৯ সাল বাংলা) কবিতাগুলি অনুবাদকের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল। কবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু'দশক পর তাঁরই উত্তরপুষ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বলে উল্লেখ করেন তাঁর সম্পাদিত "হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা" বইটিতে। এর প্রায় তের বছর পর বাংলা ভাষায় "হাইনের কবিতা" নামে আর একখানি বই সম্পাদনা করেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশিত বইটি একটি যুগের দূত। সমাজমনস্ক। সংস্কৃতিমনস্ক। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তাদেরই আছে দেশ ও জাতিকে বৌদ্ধিক মুক্তি দেওয়ার শপথ, সাহস, সামর্থ্য ও গতিশীলতা। তারাই অচলায়তন ভাঙার সৈনিক। তাদের হতে হবে দৃঢ়সংকল্প, আদর্শমুখী। তাদের শক্তি, তাদের দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের অবহিত হতে হবে।

এই যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের যথাযথ সংগঠিত করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ কাজ সরকারের, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এবং বয়স্ক নাগরিকের। তাই সংস্কৃতিহীনতার দৈন্য ও মালিন্য থেকে মুক্তি ও উত্তরণের একমাত্র ভরসাস্থল যুবসমাজ।

উদাহরণ তুলে দিচ্ছি —

বারেক ভালবেসে যে জন মজে,
দেবতাসম সেই ধন্য,
দ্বিতীয়বার পুনঃ প্রেমে যে পড়ে,
মূর্খের অগ্রগণ্য।
আমিও সে দলের মূর্খরাজ,
দুবার প্রেমপাশে জড়ি;
তপন শশী তারা হাসিয়া মরে,
আমিও হাসি — আর মরি।

তৃতীয় একটি বই বেরিয়েছে বারীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত "জার্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা" তাতে ওপরের কবিতা

টি নেই, আছে মাত্র দু'টি কবিতা, অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ শীর্ষকে। হাইনের রচনার মতই লাডইগ বোর্ন (১৮৮৬-১৯৩৭) ছিলেন গণতন্ত্রের সমর্থক লেখক। তাই জার্মানীতে "রিচ অ্যাণ্ড পুয়োর এবং লেটার্স ফ্রম প্যারিস" — বোর্নের লেখা দু'টি বইই নিষিদ্ধ ছিল। হাইনে এবং বোর্ন দুজনই জার্মানী ছেড়ে ফ্রান্সে চলে যান এবং প্যারিস বসবাস করেছেন। রবার্ট প্রন্টৎস (১৮১৬ - ১৯৭২) ছিলেন ওঁদের মতই "ইয়ং জার্মান" দলের সমর্থক। তাঁর লেখা দুটি বই — দি ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন এবং রিঅ্যাকশনারি রোমানটিকস"। এইসব স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি-সাহিত্যিক বলে পরিচিত হন বুদ্ধিজীবী মহলে। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলি ও জোট বাঁধার রীতি তখন থেকেই চলে আসছে বিশ্বের সর্বত্র। অ্যাদলফ গ্লাসবেনার (১৮১৭-১৮৭৬) লেখেন হাস্য রসাত্মক লোকসাহিত্য। তাঁর লেখা একটি অনুবাদ করেছেন সুশীল রায় —

আমরা যা — কিছু ভাবি যা — কিছু করি
প্রেরণা পাঠান তার সব ঈশ্বরই।
ঘৃণা-উপহাস কারা পাবে আছে স্থির,
সব দোষ মাপ শুধু অত্যাচারীর।
রাজপ্রতিনিধিটির উদ্ধত শির
উন্নত রাখবার খুঁজবে ফিকির।
স্বাধীন এ-পৃথিবীতে তিনি একলাই
আর কারো কোনোরূপ স্বাধীনতা নাই।
(অনুবাদ — সুশীল রায়)

জর্জ বুকনার (১৮১৩-১৮৩৭) ছিলেন "সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটস" নামের এক প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্য, যার ফলে তাঁর নামে প্রেপ্তার করবার জন্য ওয়ারেন্ট বের হয়। তাই তিনি জার্মানী ছেড়ে অষ্ট্রিয়ায় অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে চলে যান। সেখানেই টাইফয়েড রোগে মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। অল্প কয়েকটা অপেরা লিখেছেন তিনি। তবে তিনি ছিলেন একজন নিরাশাবাদী কবি। এডুয়ার্ড মোরাইক (১৮০৪-১৮৭৫) ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি। তঁার কবিতা ভাবাবেগ ও বর্ণনা প্রধান। প্রকৃতির প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ — যার ফলে দক্ষিণ জার্মাণীর শান্ত নিভৃত পরিবেশে তিনি সারাটা জীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন গোপাল ভৌমিক এবং শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। এঁদের অনুবাদের উদাহরণ —

ক) আকাশ নীল পোশাক পরা
একটি দীর্ঘ দেহ সুন্দর মুর বালক
স্নিগ্ধ সুগন্ধী এবং সুমিষ্ট মসলার
বিস্ময়কর উপহার নিয়ে আসে।
(দিন-রাত্রি — গোপাল ভৌমিক)।

খ) সর্বদা ঝর্ণারা তবু ভাষাটুকু বজায় রেখেছে,
ঘুমের মধ্যেও তারা গান গায় দিনের বিষয়ে,
যে দিন অদ্যই গত আয়ু।
(মধ্য রাতে — শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়)।

জোহান পিটার হেবেলই (১৭৬০-১৮২৬) সর্বপ্রথম জার্মানীর আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লেখেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন পাদ্রি বা ধর্মযাজক ও শিক্ষক। দক্ষিণ জার্মানীতেই ছিল তাঁর বসবাস। নল হেইস (১৮৩০-১৯১৪) এ যুগের কবি সংঘের "মধ্যমণি" ছিলেন। তাঁর জন্ম বার্লিনে। ১৯১০ সালে তিনিই প্রথম জার্মান যিনি নোবেল পুরস্কারের সম্মানে সম্মানিত। কবিতা লেখার প্রেরণা তিনি পান মায়ের কাছ হতে। তেইশ বছর বয়সে লেখা তাঁর প্রথম বই গরবিনী।

প্রভাবশালী জার্মান দার্শনিক ফ্রায়েডরিখ নিটসে (১৮৭০-১৮৭৯) কবিতাও লিখেছেন। তাঁর মতে ধবনি ও প্রকৃতিই হচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতার মূল প্রেরণা। তাঁর কবিতা অনুবাদ করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ। কবি দার্শনিক নিটসে সমস্ত নৈতিক, ধর্মীয় বন্ধন ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেছেন সাহসের সঙ্গে।

ক) জানি, আমি জানি, কোথায় উৎস মম।
আমি লেলিহান অগ্নিশিখার সম,
তারই মত আমি অত্মদহনকারী যে।
(এক্কে হোমো, অনুবাদক — নীরেন্দ্রনাথ চত্রবর্তী)
খ) ব্যথা ছিলো গাঢ় বটে —
তবু আনন্দ হতে গাড়তর ব্যথার প্রেক্ষাপটে।
(মত্ততার গান — অনুবাদক — শঙ্খ ঘোষ)।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ উল্লেখযোগ্য কবি হলেন নিটসে। এরপর বিংশ বা বিশ শতকের শু। বিশ শতকে কবিতা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শু হল কবিদের মধ্যে। তাঁরা রাজনীতির আশ্রয় ছেড়ে ব্যত্তিগত ভাবনার ভাস্কর্যে কবিতাকে সাজিয়ে তুললেন। কবিতায় তাঁরা মানুষের মনের অনুভূতি ও তার ত্রিয়া প্রতিফলন করলেন। ১৯১৪সালে প্রথম ঝিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কবিদের ভাববাদী আন্দোলন নৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। হের হিটলার ক্ষমতায় এলেন, ১৯৩৩ সালে গঠিত ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র। এই সময়টায় অনেক কবি, সাহিত্যিক দেশত্যাগ করে অন্য সব দেশে চলে গেলেন। তার ফলে জার্মানীতে একটা আদর্শবাদী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনও হল। সাহিত্যে এসে গেল বাস্তব ঘেঁষা অ াধুনিকতা, ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে সাহিত্যিক আন্দোলন যেটা শু হয়েছিল সেটাই নতুন খাতে নতুন মোড় নিল যুদ্ধোত্তর কবিতায়, সাহিত্যে। গারহার্ট হাউপমান (১৮৬২-১৯৪৬) ছিলেন অতি-বাস্তববাদীদের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন মূলত কথা-সাহিত্যিক। ১৯১২সালে তিনি পান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। তাঁর বিখ্যাত বই "দি উইভার্স" (১৮৯২) অর্থাৎ তাঁতি আসলে একটি নাটক। তবে কিছু কবিতা লিখেছেন যা তেমনভাবে উল্লেখ করার মত নয়। তিনি লিখলেন —
শোনো হে বন্ধু বেইন হোলড,
মানুষ যতই চঞ্চল প্রকৃতির
অস্থির স্বভাবের হোক,
তুমিই এক একটা দৃষ্টান্ত।
(অনুবাদক — সুশীল রায়)।
হুগো ফল হফমানসথাল (১৮৭৪-১৯২৯) প্রথম জীবনে বেশ কিছু রোমান্টিক কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতা আবেগধর্মী, একান্তই ব্যত্তিগত। তাঁর লেখা "লেটার অব স্যাডনেস" (১৯০২) আত্মজীবনীমূলক উপাদান রয়েছে। তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের শেষের দিকে নাটকই লেখেন, এবং গীতিবহুল অপেরা। কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ করেছেন তাঁর কবিতার বাংলা অনুবাদ। এখানে তার উদাহরণ দেওয়া হল —
ক) অনেকের ভাগ্য জানি আমার ভাগ্যের
সঙ্গে বিজড়িত এক টানাপোড়েনের
অমোঘ নিয়মে, আহা অস্তিত্বের দায়
সবাইকে নিয়ে খেলে, বার বার বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ইতস্ততঃ।
(কিছু যথার্থ — অনুবাদক — নচিকেতা ভরদ্বাজ)।
খ) স্ফটিকের উৎসধারা, প্রতিমূর্তি স্থিত সুরক্ষিত
নিত্য কুসুমিত কুঞ্জ ঘনচ্ছায়া তবীথি তলে,
এবং যেখানে মৃদু মর্মরিত হাওয়া বয়ে চলে।
(অভিযাত্রীর গান — অনুবাদক — নচিকেতা ভরদ্বাজ)।
অন্য আর এক জার্মান কবি হলেন হেরমান হেমস (১৮৭৭ — জন্ম)। নাৎসীবাদের বিরোধিতা করার অপরাধে তিনি তঁ ার জার্মান নাগরিকত্ব হারিয়ে সুইজারল্যান্ডে চলে যান এবং সে দেশের নাগরিকত্ব নেন। তাঁর বাবা-মা দুজনেই ছিলেন ভ ারতবর্ষের ধর্মযাজক। যাজকের ছেলে হেসকে বাইশ বছর বয়সে এক বইয়ের দোকানে সামান্য মাহিনায় চাকরি করতে

হয়। বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনি সাহিত্য রচনায় বিশেষত কবিতা লেখায় আগ্রহী হন। ভারতের পটভূমিক ায় লেখেন তিনি "সিদ্ধার্থ" কাব্য-উপন্যাস। ১৯০২ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে তিনি নানান কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "পিন্টার ক্যামেনৎসিনজ"। ১৯৪৬ সালে তিনি পেলেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, চিত্র-শিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর কবিতার সংখ্যা তিন হাজ ারের বেশি। তাঁর একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় —

একা দলছুট ভী হাওয়া যায় বয়ে।
পিছনে আকাশ চোখ লাল করে আছে,
আলো পড়ে এলে ভর সন্ধ্যার ভয়ে,
গুটি গুটি এসে মৃত্যু ঘেঁষবে কাছে।
(যৌবন যায় — ানুবাদক — সুভাষ মুখোপ্যাধ্যায়)

গট ফ্রায়েডে বেন (১৮৮৬-১৯৫৬) ছিলেন বার্লিনের এক চিকিৎসক। কিন্তু কবিতা লিখেছেন। তাঁর ছিল একটি র াজনৈতিক মতাদর্শ কবিতায় যা রূপ পায়। তাঁর লেখা প্রথম পর্বের কবিতায় মানুষের বাস্তব-জীবনের জরাজীর্ণ অস্তিত্বেরই একটা ব্যাধিগ্রস্ত দিক ফুটে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি কবিতায় বাস্তবতার ঊর্দ্ধে সুন্দর ও পবিত্র যা কিছু তারই বন্দনা করেন। দুটি

বি্ব যুদ্ধেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন আর্মি ডাক্তার হিসেবে। তাঁর লেখা দুটি কবিতা অনুবাদ করেন গোপাল ভৌমিক ও ম ানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক) অ্যাস্টারগুলি স্যাঁৎসেঁতে দিন আনে,
মন্ত্র এবং পুরানো ডাইনিতন্ত্র;
ঘন্টাখানেক দেবতারা দ্বিধা মানে,
বন্ধ তাদের সকল তৌল যন্ত্র।
(অ্যাস্টার — অনুবাদ — গোপাল ভৌমিক)।

খ) একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধশূন্যের মধ্য থেকে উঠে আসে
অনুভূত জীবন, আকস্মিক চেতনা,
সূর্য নিশ্চল, স্তব্ধ সকল বৃত্ত
কেবল সব কিছু এগিয়ে আসছে একটি শব্দের কেন্দ্রে। (একটি শব্দ একটি বাক্যবদ্ধ — অনুবাদক — মানবেন্দ্র মুখোপাধ্য ায়)

গট ফ্রায়েড বেন প্রশ্ন রেখে যান — "কবিরা কি পৃথিবী পাল্টে দিতে পারে?" তারই উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে যাঁর কবিত ায়, গানে, নাটকে তিনি বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি বারটোল্ট ব্রেসট মতান্তরে ব্রেমট (১৮৯৮-১৯৫৬)। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ন াট্যকারও। জন্ম তাঁর দক্ষিণ জার্মানির অকসবার্গে। ১৯৩৩ সালে হিটলার যখন ক্ষমতায় আসেন ব্রেসট তখন দেশ ত্যাগ করে প্রথমে যান অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন ও রাশিয়ায়। সবশেষে আমেরিকায় বসবাস করেন যুদ্ধকালীন সময়টায়। যুদ্ধ শেষ হলে তিনি আবার স্বদেশ জার্মানীতে ফিরে আসেন। পরবর্তী জীবনে তিনি মার্কসবাদে বি্বাসী হয়ে উঠলেন এবং কবিত ায়, গানে নাটকে তাকেই ফুটিয়ে তুললেন এক আদর্শ হিসেবে। তিনি বুঝলেন, মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা হল তিনটি শক্তি — শ্রেণী বৈষম্য, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। থিয়েটারে তিনি যুগান্তর ঘটালেন, সংলাপ ব্যবহারের, মঞ্চ সজ্জায়, পদ্ধতিগত নতুন আঙ্গিকের উপস্থাপনায়। কলকাতার থিয়েটারে ব্রেসট এখনও অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক। তাঁর লেখা অপেরাধর্মী নাটকগুলি হল — তিন পয়সার পালা, গ্যালিলিওর জীবন, ককেসিয়ান সার্কল, মাদার কারেজ এবং তাঁর সন্তানেরা মিওভাঞ্চের সৈনিক, মানব মূর্তি প্রভু পুনটিলা ও তাঁর ভৃত্য ম্যান্টি প্রমুখ। ১৯৪৭ সালের ৩০ অক্টোবর অ-মা র্কিনী কার্যকলাপের অভিযোগ অভিযুক্ত হয়ে যখন তিনি আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ান তখন বলেন — "আমি একজন নাট্যকার ও কবি।" আজও তিনি মুকুটবিহীন সম্রাটের মহিমায় অধিষ্ঠিত বি্বের সব প্রগতিশীল নাট্যমঞ্চে। নাট্যকার ব্রেসট ও কবি ব্রেখট অভিন্ন ব্যাক্তিত্ব — এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে তাঁর কবিতার অনুবাদে। স্বনামধন্য বাংলা ভাষী কবিরা

করেছেন তাঁর কবিতার অনুবাদ, নাটকের ভাবানুবাদ। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র দিয়ে শু করে বাংলা সাহিত্যে ও নাট্যজগতের বহু ব্যক্তিই করেছেন তাঁর রচনার অনুবাদ। এখানে তার দু'একটি মাত্র নমুনা তুলে দিচ্ছি —

ক) ভয় দেখিয়ে লাভ নেই আর আগ্নেয়াস্ত্র নাও হটিয়ে।
তবে কি বোঝো না গুলিবর্ষণ ছাড়া অন্য কোন ভাষা?
তাই হবে তবে, কড়া ত্রান্তিতে পাওনা দেব মিটিয়ে।
ঐ আগ্নেয়াস্ত্র ঘুরিয়ে ধরবো, মিটবে তোমার আশা।
(প্রতিজ্ঞাপত্র — অনুবাদক — উৎপল দত্ত)

খ) কীর্তি তোমার কোনদিন আর ঘনিষ্ঠ উত্তাপে
আতপ্ত করে দেবে না প্রিয়ারে প্রখর রৌদ্রালোকে
তুমি চলে গেছ যেমন ত্রস্ত চলে যায় কুয়াশারা
পড়ে আছে দিন উত্তাপহীন নমিতা ক্লান্ত শোকে।
(সৈনিকের গান — অনুবাদক — সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)।

গ) অতএব মহাশয় শুনুন দিয়ে মন
বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ কন — নন্।
(তিন পয়সার পালার একটি গান — অনুবাদক — অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ঘ) প্রায়শঃ বন্দনাধন্য এবং বিশ্রুত
কমরেড লেনিন।.....
(লেনিন বন্দনায় কুবান বুলাকের সতরঞ্জি তাঁতী — অনুবাদক — শান্তিশেখর সিংহ)।

বিশ শতক যেমন গীতি কবিতার যুগ তেমনই গদ্য-কবিতারও যুগ। এ যুগের কবিরা গদ্যের মত করে লিখলেন কবিতা। কারণ তাঁরা দেখেছেন, এই মরা মাটি, এই আর্ত জগৎ আর যুদ্ধের ধবংস-লীলা। তবুও ব্রেসট আশাবাদী। তাই তিনি লিখলেন —

ভালো লোকে যাতে থাকে ভালো, আর সুখেও অন্তত।
ভদ্রমহোদয় ভদ্রমহিলাবৃন্দকে বলি তবে —
আনন্দিত সমাপ্তিই হতে হবে, হবে হবে হবে।
(অনুবাদক — সুশীল রায়।)

কবিতায় শেষ পর্যন্ত শিল্প, সাহিত্য ও জীবনের শ্রবণীয় ও মননীয় নির্যাস খুঁজে পেয়েছিলেন ব্রেসট এক যুগ আগে। বর্তমানে তাঁরই উত্তরাধিকার বর্তেছে গুন্টার গ্রাসে। মূলতঃ ঔপন্যাসিক হলেও বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন তিনি। তিনিও চরমপন্থী জার্মান কবি ও লেখক। ভারত সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা তাঁকে বার বার ভারতে টেনে এনেছে। কবিতায় তাঁর একছত্র আধিপত্য। কবিতাই হল সাহিত্যের জননী। পদ্যই আদি সৃষ্টি, গদ্য এসেছে অনেক পরে। মানুষের মনের সীমাবদ্ধতার মূলে আঘাত করার শক্তি রয়েছে কবিতার। সম্প্রতি প্রকাশিত গুন্টারগ্রাসের বই "জিব কাটা" গদ্য, পদ্য এবং কালো কালির আঁকা ছবির সংকলন। গদ্যে বর্ণিত বিষয় বস্তুই উপসংহারে স্থান পেয়েছে দীর্ঘ এক কবিতার রূপে। তাঁর মূল বক্তব্য হল — "দারিদ্র মানবতার অভিশাপ।" গ্রাসের বক্তব্য স্পষ্ট, বাস্তব রসাশ্রিত এবং অকপট যে কারণেই তাঁকে বলা হয় ভারত-পথিক, বিখ্যাত ও বিতর্কিত এক ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন ভাবনা ও মেজাজ নিয়ে তিনি লিখে চলেছেন তাঁর কবিতা, কখনও জার্মানী, কখনও ভারত তথা কলকাতাকে বিষয় করে। এঁরা ছাড়া কুর্ট পিনথাস (জন্ম ১৮৮৬তে), জর্জ হিউম, হেনরিখ লারস, রিলকে এবং হোলডারলেনের নাম উল্লেখ করা যায় যাঁদের কবিতা বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এঁদের কবিতার এক একটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য সংক্ষেপে করছি। কুর্ট পিনথাসের ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় এক কবিতা সংগ্রহ। তিনি ভাববাদী ছিলেন। রেইনার মারিয়ার কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটি উদাহরণ —

ক) পূর্ণ তিনি ঃ তিনি সব, তাঁর পাশে ফিরি আশা করে,
দেখিবেন আমাদের, কি দুরাশা!
(বুদ্ধ — অনুবাদক — সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)
খ) হে কবি আমাদের বলো তুমি কি যে করো?
— আমি প্রশংসা করি।
কিন্তু মারাত্মক এবং দানবীয় সব ব্যাপার
কেমন করে সহ্য করো, কেমন করে মেনে নাও সে সব?
(কবি — অনুবাদক — হরপ্রসাদ মিত্র)।
ফ্রেডরিখ হোল্ডারলিনের কবিতা অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণশংকর সেনগুপ্ত এবং হুমায়ুন কবীর।
ক) কিন্তু আমাদের
নিয়তি দেয় না শান্তি; তাপিত মানুষ,
প্রতিহত
অবিরল অধঃপাতে, বৎসরের অনিচয়তায়।
(হাইপেরিয়ান গান — অনুবাদক — বুদ্ধদেব বসু)।
খ) তোমাদের বোঝে না এরা তিতিক্ষায় স্তব্ধ তুমি তাই,
এই সুমধুর দিনে, আলোকিত ধরণীর পানে,
গরীয়সী তুমি, বৃথা নীরবে তাকিয়ে আছ হায় .....
(জিওতিমা — অনুবাদক — নরেশ গুহ)।
ক্লিমেন্স ব্রেটানোর কবিতা অনুবাদ করেছেন অরবিন্দ গুহ ও কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ক) গাও একটি সুমধুর শান্ত গান,
শিলা খণ্ডে তরঙ্গিত নির্ঝরের মতো .....
(ঘুমপাড়ানি — অনুবাদক — অরবিন্দ গুহ)।
খ) প্রেমের গান যেন মৃদু প্রার্থনা,
কী সে মধুর আলাপে হৃদয় ভরে;.....
(সন্ধ্যায় — অনুবাদক — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।
অনুবাদের মাধ্যমেই কেবল বিশেষ কোন দেশ বা জাতিকে জানার পথ সুগম হয়। তাই অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সব সময়ই রয়েছে। ভারত-জার্মান মৈত্রী এভাবেই সম্ভব হয়। ভারততন্ত্রের জন্ম জার্মানীতে। ম্যাকসমুলার ছিলেন তার পথিকৃৎ। তবে ভারতচর্চার জোয়ার জার্মানীতে এখন অনেক স্তিমিত। বন্ধু রোটেনস্টাইন সাহায্য না করলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই "গীতাঞ্জলি" অনুবাদের মাধ্যমে "নোবেল পুরস্কার সংস্থার" দরবারে পৌঁছাতো না আর কবির ভাগ্যেও বর্ষিত হত না বিরল স্বীকৃতি "নোবেল পুরস্কার"। মুকুল গুহ "অনুবাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা"নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন "শারদীয় মহানগর" পত্রিকায় ১৩৯২ সালে। এরপর প্রাবন্ধিক জাহিল হাসান সম্প্রতি "অতলান্তিক" পত্রিকায় (১৩৯৯ সাল, মাঘ সংখ্যায়) এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন — "অনাসৃষ্টি নয় অনুসৃষ্টি" প্রবন্ধে। জাহিল হাসান লিখেছেন — "আমার জানার জগৎ কল্পনার জগৎকে বিস্তৃতকরেছিল ছোটবেলায় পড়া অনুবাদ সাহিত্য।" কথা টি শুধু তাঁরই নয় আমাদেরও। ইরাকের বাগদাদ শহরে আল মাসুন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "বেথ এল হিকমান, ৮১৩-৩৩ অব্দে। ঐ প্রতিষ্ঠানে ভারত, গ্রীস প্রভৃতি বিদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শনের খবর অনুবাদ করে আলোচনা করা হত। এভ াবেই তুরস্কের জাতীয় জীবনে ইউরোপীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাব পড়ে "আ ববাসিদ" সংস্কৃতির ওপর। জাপানে "বুনসেই কাইকা" নামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছল হিয়োকুমা আন্দোলনের উত্তরপর্বে। হিয়োকুমা অ ান্দোলনের ফলে উনিশ শতক থেকেই এশিয়া ও ইউরোপের অমূল্য সব সাহিত্য সম্পদ অনুবাদের মাধ্যমে জাপানে

পৌঁছয়। জার্মানীর "ইয়ং জার্মান" স্পেন — বেলজিয়ামের গ্রীন রিভোলিউশন, ভারতের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এভাবেই ঝি-সভার দ্বার খুলে দেয়। মুকুল গুহ মনে করেন — "সৃষ্টিমূলক কোন কিছুর অনুবাদ তখনই সম্ভব যখন সৃষ্টিমূলক অনুবাদকের দল তৈরী হয়।" গদ্যের চেয়ে পদ্যের অনুবাদ কঠিন। আবু সৈয়দ আইয়ুব মনে করতেন — "কবিতার যথার্থ অনুবাদ কিন্তু সাহিত্যিক অনুবাদ নয়। অনুবাদক যদি সুকবি হন তবে ছন্দ-মিলের সৌষ্ঠবে নতুন কিছু মূল্য সংযুক্ত হতে পারে।" বিখ্যাত উর্দু কবি ইকবাল কবিতার অনুবাদ করতে বসলেই নতুন একটি কবিতা লিখে ফেলতেন। কবিতার অনুবাদে মূল রচনার ধবনি, ছন্দ, মাত্রা এসব যদিও বা ত্যাগ করা যায় কিন্তু ভাবকে সরিয়ে ফেলা উচিত নয়। সঙ্গতভাবেই অনুবাদের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি এসে যায়। এককালে বিদেশী সাহিত্যের বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের ভায়েরা এবং পরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অনুবাদ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহ এবং অণ মিত্রের মত অধ্যাপকরাও এ বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন এবং আছেন এখনও। তবুও অনেকে বলেন — "অনুবাদ গড়া আর অন্যকে দিয়ে পিঠ চুলকানো — একই ব্যাপার। কিছুতেই সুখ পাওয়া যায় না" সমস্যা তো থাকবেই, সমাধানের পথও খুঁজে বের করতে হবে সমস্যার মূল সূত্রটি মনে রেখে। তবেই কবিতার সৌন্দর্য থাকবে অম্লান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com